## পিসিমা

নিখিল পান্ডে

পিসিমা বচসা শুরু করে দেয়। কন্ডাকটারের সাথে। দ্যাননি মানে? একটা কুড়ি টাকার নোট দিলাম না। — দু'টো ভাড়ার কাটুন। আসানসোল-অন্ডাল। মজা পেয়েছেন!

পিসিমা যথেষ্ট দাপুটে মহিলা। কন্ডাকটার বার বার তা নাকচ করে। পিসিমার পারদের ব্যারোমিটার চড়্ চড় করে বাড়তে থাকে। ফেটে পড়ার অপেক্ষায়। রাগে কট্ মট্ করে দৃষ্টি ফেলে কন্ডাকটারের মুখমন্ডলে। সার্চ লাইটের মত।

কন্ডাকটার আঙুলের ফাঁকে ধরে রাখা নানা সারি সারি টাকার দিকে তাকায়। আইডেন্টিফাই করতে ব্যর্থ হয়। একবার তাকায় আঙুলের ফাঁকে সজ্জিত টাকাগুলোর দিকে। আর একবার তাকায় পিসিমার মুখের দিকে। বারবার। এইভাবে তিনবার। মনে হয় শেষ-মেষ পিসিমার মুখমন্ডলটাকেই কুড়ি টাকার নোট ভেবে আশঙ্কায় পিছিয়ে আসে সে। দুটি ভাড়ার কেটে নিয়ে আঠারো টাকা গুনে গুনে ফেরৎ দেয়। শেষ-মেষ বলে— 'দয়া করে গুনে নিন',। পিসিমা ফের কট্‌মট্ তাকিয়ে না গুনেই হাতের তালুতে লুকিয়ে থাকা বিমর্ষ পার্সে চালান করে দেয়। তিনটি পাঁচ টাকা, একটি দু'টাকা ও এক টাকার নোট।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যাত্রীরা। বাস ছুটছে। আসানসোল - নবদ্বীপ সুপার। বাসের ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। পিসিমা অন্ডালে নেমে পড়ে। সাথে গোবেচারা পিসেমশাই আর একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, নাম মোহিত।

এই ঘটনাটি পিসিমার কাছেই শোনা। ভাড়া দেওয়ার কোন টাকাই ছিল না সে সময় পিসিমার কাছে। গল্পের ছলে ঘটনাটা বলতে বলতে ডুক্‌রে কেঁদে ফেলেছিল পিসিমা। আমি তখন কিশোর। পিসিমার আনা মিষ্টি আমার হাতে। খাচ্ছি পরম সুখে। চোখে বিস্ময়। আর্থিক দুরবস্থার ঘূর্ণাবর্তে তখন পিসিমা দম্পতি।

আজ পঁচিশ বছর পর- পিসেমশাই গত। পিসিমার সার্চ-লাইটের মত চোখ দখল করেছে সাদা ক্যাটারাক্ট্। পিসিমার অবস্থা ফিরিয়েছে মোহিত। আর এখন আসানসোল-অন্ডাল ভাড়া নয় টাকা জন প্রতি। এখনও সেই প্রসঙ্গ উঠলে দেখতে পাই পিসিমার চোখ জলে চিক্‌চিক্ করছে। আর বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে দীর্ঘশ্বাসরূপী এক বিশাল ময়াল।

---

## উত্তর - দক্ষিণ

ধীরেন দেব

জয়েন্টের রেজাল্ট বেরোল। সুমন উতরোয়নি। ছেলের এই রেজাল্ট দেখে নরেন ও জয়া চৌধুরী খুব দুঃখ পেলেন। ভালো ভালো হাফ ডজন টীচার দিয়ে ছেলের এই ব্যর্থতায় ওরা বড়ই নিরাশ। সুমন তাদের একমাত্র সন্তান। ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবে, এই ছিল চৌধুরী দম্পতির স্বপ্ন। বিশেষ করে জয়ার ইচ্ছেটা ছিল সুমন ডাক্তার হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই বেরোল হায়ার সেকেন্ডোরীর রেজাল্ট। দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করল সুমন। বাবা মার মনে আবার দুঃখ, হতাশা। অতো টীচার দিয়েও ছেলেটা প্রথম বিভাগে পাশ করল না, স্টার, লেটার দূরে থাক।

জয়া নরেন চৌধুরীকে বলেন, কী হবে ছেলেটার? ভালো কলেজও জুটবে না সুমনের। নরেনবাবু বলেন, কিসসু ভেবো না। আমি খোঁজ খবর নিয়েছি। ওকে সাউথে পাঠাবো। এই বঙ্গে ওর কিসসু হবে না। মোটা ডোনেশন দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি করাবো। নিতাইবাবুর ছেলে লাখ টাকা ডোনেশন দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোল বলে। জয়েন্ট ফয়েন্ট কিসসু দেয়নি। টাকা আছে ভয় কিসের? দেখো তোমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে। জয়া বলেন, টাকাই যখন খরচ করবে, তবে ডাক্তার বানাচ্ছো না কেন? আমি দিল্লীতে দাদা বৌদিকে এক বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছি সুমন ডাক্তারি পড়বে। তাই করো না গো। নরেনবাবু বলেন, শোনো জয়া, ডাক্তারির চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের পেশা বেটার। এই দেখো না, আমার কারখানায় এম. ডি. মানে ম্যানেজিং ডাইরেকটার একজন ইঞ্জিনিয়ার। চিরদিন তাই হয়ে আসছে। ভবিষ্যতেও তাই হবে। ডাক্তার কোনদিন এম. ডি. হবে না। জয়া মুখ ভার করে উঠে পড়লো।

পারচেজ ডিপার্টের কর্মী নরেন চৌধুরী ঘুষের অঙ্কটা বেশ বাড়িয়ে দিয়েছেন। ছেলেকে পড়াতে অনেক টাকার দরকার। ব্যাঙ্গালোরে খাই খরচও আকাশ ছোঁয়া। এই টাকাটা ম্যানেজ করতেই হবে। সুতরাং আরো টাকা চাই, যে কোন উপায়ে।

ছেলেকে সাউথে পাঠাবার সব ঠিকঠাক। নরেনবাবুর এখন খোশ মেজাজ। অফিসে একে তাকে ডেকে ছেলের গল্প করেন। অন্যদের খোঁজ খবরও নিচ্ছেন। আদেশ দিচ্ছেন অন্য বাবাদের।

অজয়বাবু করিডর দিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে নরেনবাবু কাছে ডেকে বসালেন। বললেন, আপনার ছেলে এইবার হায়ার সেকেন্ডোরী দিয়েছিল না? পাশ করেছে? কোন ডিভিশনে? কম কথার মানুষ অজয় বলেন, পাশ করেছে। ফার্স্ট ডিভিশনে। লেটার পেয়েছে নাকি? হ্যাঁ, গোটা তিনেক পেয়েছে। কোথায় পড়ানে? এইখানেই বি.এসসি পড়বে। অনার্স পেলে ভালো। দূর মশাই এই বঙ্গে কী পড়াবেন? একমাত্র ছেলে, ওকে সাউথে নিয়ে চলুন। মানুষ হবে? —ওসব জায়গায় ছেলেকে পড়ানো সম্ভব নয়। অনেক অনেক টাকার দরকার। অতো টাকা পাবো কোথায়। মাইনে তো আপনার সমানই পাই। অজয়বাবু উঠে পড়লেন। বললেন, কাজ বাকি, যাচ্ছি। আসুন বলেই নরেনবাবু বিদ্রূপের হাসি হেসে আপন মনে বলতে থাকেন, উনি ঘুষ খাবেন না। সাধু সেজে সহকর্মীদের বাহবা কুড়োচ্ছেন। বোকা! আরে বাবা, আজকাল কে ঘুষ খায় না? রাজা-মন্ত্রী, উজির নাজির পেয়াদা সবাই ঘুষ খায়। আর তুমি হরিদাস সৎ সেজে বসে আছো। একটা মাত্র ছেলে। ওর কথাও ভাবছে না লোকটা।

দিনকয়েক পর দুর্গাপুর স্টেশনে অজয়বাবু নরেনবাবু মুখোমুখি। অজয়বাবু বললেন কোথায় চললেন নরেনবাবু? এই তো ছেলেকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছি। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি করাবো। বলেই নরেনবাবু তৃপ্তিতে হেসে উঠলেন। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ছেলেকে তুলে দিতে এলাম, চাকরি পেয়েছে। চাকরি পেয়েছে। এতো ভালো খবর। কোথায় পেলো চাকরিটা? এখন ব্যারাকপুরে ট্রেনিং-এ থাকবে। ট্রেনিং শেষ হলে পাঠিয়ে দেবে কাশ্মীরে, প্রয়োজনে কারগিল ফ্রন্টে। শুনেই নরেনবাবু একটা ঢোক গিলে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হলো না। ট্রেন ইন করছে। যাত্রীরা দ্রুত উঠছে-নামছে। অজয়বাবুর পুত্র অনিন্দ্য চট্‌পট ট্রেনে উঠে পড়লো। নরেনবাবু ভীড় ঠেলে ট্রেনে উঠে যতোটা সম্ভব ছেলেকে কাছে টেনে বুক আগলে দাঁড়ালেন। কামরার এক কোণে।

---

**একটি মুখবন্ধ খাম**

মীনা দাস

কাবেরী বাইরে থেকে একবার অতসীকে ডাকল। অতসী জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। মন ভাল নেই তার। বিষণ্ণতা শীতের মেঘলা আকাশেরমতো তার মনে, বহুদিন থেকে। কাবেরীকে দেখে একবার চোখ দু'টোতে তার ঝিলিক উঠলো। বুকের এক কোণে বিদ্যুৎ দহন। তারপর মোলায়েম বিস্ময়ে বললে— কিরে, তুই? কাবেরী একটা খাম দিল অতসীকে। মুখটা সাঁটা। একটু ভারী। কিরে এটা?

কাবেরী ঝিকমিকিয়ে রহস্যময় গলায় বলল— 'চিঠি'। আবীরদাকে দিস। খুলে পড়িস না যেন? আমি নিজে হাতেই দিতাম। কিন্তু আজ বিকেলেই রওনা হচ্ছি রাঁচি। মামাতো দাদার বিয়ে। তোদের এখানে আবীরদা তো আসেই। দিয়ে দিস তাহলে? চলি। যাওয়ার সময় তেমন একটু তাকিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল কাবেরী। তারই একদা প্রাণের বন্ধু। মাসখানেক আগেও ছিল। কিন্তু এখন!

অতসী সেই থেকে জ্বলে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। খামটা খুলে একবার দেখবে সে? কী লিখেছে কাবেরী তারই আবীরকে। আবীর! আবীর তো তারই ছিল। এখন? বুকের মধ্যে কী যে খেয়ে যাচ্ছে কুর কুর।

আবীর সেন। দাদার বন্ধু। থাকতও তখন বাড়ির কাছাকাছি ভাড়া। দাদার সঙ্গে যাতায়াত এ বাড়িতে। আর তারই ফলে কবে একদিন দু'জন দু'জনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। আর সত্যিবলতে কি আবীর সেনকে দেখে যে কোনো মেয়েই মুগ্ধ হতে পারে। অদ্ভুত মায়াময় রূপ আবীরের। ঈষৎ লম্বাটে মুখে চাপ দাড়ি। মাথায় ঘন চুল। পুরুষালী লম্বা দীপ্ত চেহারা ঠোঁট-মুখ চোখ পড়াশোনাতেও তুখোড়। ফলতঃ অহঙ্কারী কিছুটা। মা-বাবার একমাত্র ছেলে। তুলনায় অতসী কিছুটা নিরেস, অতসী তা নিজের মনে স্বীকার না করে পারে না। তবু আবীর তাকে ভালবাসল। গোপনে গোপনে উচ্ছ্বসিত চিঠির আদান প্রদান। সেরকম সময়ে একদিন কাবেরী দেখে ফেলল আবীরকে। আবীর তখন বেরিয়ে যাচ্ছে দাদা প্রবীরের সঙ্গে। কাবেরী সটান জিজ্ঞাসা করল—।

—কে রে? ভারি সুন্দর দেখতে তো,

—কেন? জেনে কি করবি? অতসী অতিরিক্ত স্মার্ট কাবেরীকে মনে মনে ভয় করে, বিরক্তও।

—আহা বলই না! প্রেম করবো ভাবছি। কাছেই থাকে বুঝি?

—হুঁ, মানে ছিল। এমন অনেক দূরে চলে গেছে।

—তাই? কি পড়ে রে?

ঠিক এর কিছুদিন পরই একদিন আবীরের একটা চিঠি বাবার হাতে পড়ে গেল। চিঠির ভাষা পড়ে জেনে গেলেন সবাই। একি অসভ্যতা! হোক না সে ছেলের বন্ধু। ফলে অতসীর উপর চলল কিছু ঝড় ঝাপটা। এবং আবীরের আসও একদম বন্ধ হয়ে গেল এ বাড়িতে। দু'জনের মধ্যে চিঠির তবু লেনদেন ছিল—খুব অল্প। দাদা তখন কাবেরীদের কোচিং-এ পড়াচ্ছে। আর দাদার মুখেই একদিন শুনতে পেল অতসীর ওখানে নাকি আবীর পড়াতে শুরু করেছে। চিঠির যোগাযোগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। অতসীর বুকের মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ, বিষণ্ণতা বাড়তে থাকে। আবীরদা তাহলে কাবেরীর দিকে ঢলে পড়েছে এখন। তারই হাত দিয়ে দু'জনের চিঠির আদান-প্রদান...

প্রদীপ রাতের দিকে বোনকে হঠাৎ ডাকে— অন্তি, কাবেরী কিছু দিয়ে যায়নি আবীরকে দেবার জন্য?

—হুঃ একটা খাম। মনে মনে অতসী ভাবে, ওঃ দাদাও আছে এ ষড়যন্ত্রে!

—নিয়ে আয় তো। দিয়ে আসি গিয়ে আবীরের হাতে। নাহলে আবার ওই ছুতো ধরে এসে উপস্থিত হবে এ বাড়িতে। নিয়ে আয়—

—চিঠিটা বুঝি খুব জরুরী—

—চিঠি? চিঠি কোথায়? ও তো টাকা। একমাস হ'ল —ও'র মাইনেটা...

অতসীর মনটা হঠাৎ ভারমুক্ত হালকা তুলো যেন। 'দাঁড়াও আনছি' — সে দ্রুত ছুটতেই থাকে। ইস্ খামটা তখন ভাগ্যিস ছিঁড়ে ফেলেনি। কিন্তু টেবিলের উপর যদি না থাকে। আজ যা হাওয়া। উড়ে যদি জানলা দিয়ে বাইরে চলে যায়? তবে? অতসী আরো জোরে পা চালায়... তার ঘরের দিকে...।

---

**শহরের গাছ**

বিমান চট্টোপাধ্যায়

জায়গাটা এখনও মধ্যবিত্তই রয়ে গেছে দেখছি। সেই আগের মতই কামারের হাপর, মুদিখানার ঘুপচি বা তার সঙ্গে লুঙ্গিপরা উবু কিংবা

টেরিলিনঢাকা বুক  রাস্তার ধুম ওঠা ধুলো খেতে খেতে বহমান এখনও। অনেকদিন ওদের সঙ্গে দেখা নেই। নির্দিষ্ট গাছটার নিচেও কাউকে দেখতে পেলাম না।

ফুটো চালার নিচে বসে ভাঁড়ের চা চুমুক দেওয়ার আগেই আমার চোখে পড়লো। কৌতূহলকে কোনোরকম জামাকাপড় পরাবার আগেই তা বেরিয়ে পড়লো, গাছটার গায়ে খড়ি দিয়ে নম্বর লিখেছে কেন দাদা?

উত্তর নেই। কাগজের উপর চোখ রেখে লোকটা, পিপাসার্ত বোধ হয়।

দেবেশ, ভুবন, হরগতি—কেউ নেই গাছের নিচে। থাকা সম্ভব নয়। কারণ এখন একবছর পর পর দেখা হয় আমাদের। আমরা শরীর বাঁচিয়ে একে অপরকে ছুঁয়ে নিই। ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্যমূলকভাবে অচেনা হয়ে থাকি। বলি ব্যস্ত আছি। ভালতো?...

তবু আশা করে এসে আজ কাউকে পেলাম না। পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ একদিন আমার প্রতি এক ঘন্টা পর পর একে অপরের জীবনী পর্যন্ত বলে যেতে পারতাম।

তখন আমাদের ফিসফাস নিম্নস্বর, চকরির দরখাস্ত উল্লাস, জ্যোৎস্না ও অন্ধকারে জিভে জিভ ছুঁইয়ে ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম। আর ওই বিশাল বটগাছটা তখন শিশু সবুজ কচিপাতা বাতাসে ভীরু কাঁপতো। আমরাও কাঁপতাম। গাছটাকে নিয়ে আমরা পাঁচজন।

—আচ্ছা দাদা গাছটার গায়ে খড়ি দিয়ে নম্বর কেন? কেউ জানে না বোধ হয়। বেশ বড়। সঙ্গে গাছটাও। ধূসর ডালগুলো বেশ শক্ত। একতলার সমান উঁচু। দক্ষিণের ঝাপটায় প্রায় সোজাই থাকতো। আমরা প্রতিদিন একে অপরের মর্জি কিংবা চিরুনি হারিয়ে যাওয়ার খবর নিতাম।

কয়েক বছর বাদে। দেবেশ, ভুবন, হরগতির নামের বেশ হাঁক ডাক। মানুষের সভ্যতার যখন ওরা ধারক ও বাহক, তখন গাছটার ও সবুজ পাতার আত্মবিশ্বাস দোতলার সমান উঁচু। ডালগুলি আরও অভিজ্ঞ আর মোটা। আর অভিজ্ঞ আমরাও। তখন প্রতি সপ্তাহ থেকে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে প্রতি মাসে দেখা করেছি। মেদবহুল গলায় টাই। সোনার সিগরেট কেস। সবাই খুব ব্যস্ত। হাসছি কিন্তু সযত্নে নিজের অভিজ্ঞতার কথা লুকোচ্ছি। কিন্তু তখন গাছটার নিচে ছোট বয়সের বন্ধু আমরা।

—আচ্ছা দাদা, গাছটার গায়ে নম্বর কেন? সম্ভবত পাখিগুলো ছাড়া কেউ জানে না!

ধাপে ধাপে দেবেশ এখন খুব বড় সাংবাদিক। ভুবন মন্ত্রী। হরগতি ডাইরেক্টর। তারা এখন জ্যোৎস্না দেখলে খোলা স্প্রিং -এর মতো লাফিয়ে ওঠে। গাছটা যথাযথই প্রচলিত ভাষায় 'মহীরুহ'। ভয়ঙ্কর মোটা ডাল। অসংখ্য শিকড় মাটির গভীরে। বাড়ি এলে ওদের সঙ্গে এখনও এক বছর পর পর দেখা হয়। এখনও দ্রুততার মধ্যেও হাসে।

আমি কিছু হইনি। হতে পারিনি! এবার অনেকদিন বাদে এলাম। ওদের কাউকে দেখছি না ক'দিন। ভাবছিলাম গাছটার নিচে বসবো কিনা। যোগসূত্রটা কোথায়? দারুণ বিরাট হয়ে গেছে গাছটা। অজস্র জটিলতা নিয়ে ঋজু দাঁড়িয়ে আছে।

—আচ্ছা দাদা আপনি জানেন? গাছের গায়ে নম্বর কিসের?

—জনি।

—কী জানেন?

—গাছটাকে কেটে ফেলা হবে এবার!

—কেন!! চমকে উঠলাম!

গাছটার এখন আর দরকার নেই। মানুষের ঘর নোংরা করছে বড়।

---

**ভাঙন**

সেবন্তী ঘোষ

ভাঙ্গনের শেষ চারদিন কেউ কোন কথা বলছিল না।

আশ্বাসের মতো পরম নিশ্চিন্তে রান্নাঘর ঝুলে থাকলো, তার মাথার ওপর নরম ছাতার মতো আমগাছ, দোতালায় ওঠার সিঁড়ি, কাদায় পা ডুবিয়ে জল দেখছিল, ঘূর্ণি সরে গেলে নিমজ্জমান মানুষের মতো মাথা ঠেলে উঠছিলো স্কুলবাড়ি। আব্রু রক্ষার কলঘর তখন মাঝগঙ্গে।

ভাঙনের শেষ দিনগুলো চুপচাপ ইট সরিয়ে নিচ্ছিল কেউ, বাঁশ ফেলে খুবলে ওঠা গর্তের মাপ নিয়ে আর শুধু শুধুই যেন ঠিকানা মনে রাখলো ফিরে আসবে বলে—

ততোক্ষণে নতুন চর দখল হয়ে গেছে। প্লাস্টিক আর যোজনার টিন দিয়ে দিব্যি শুরু হয়েছে সংসার। টিঙটিঙে পেয়ারা গাছে দোলা খাচ্ছে কাঁটা লাগা চুড়িদার, রেডিও মিরচির নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে লঙ্কা ফোড়নের ঝাঁজ—

ভাঙনের শেষ দিনটি বিষণ্ণ অথচ অনিবার্য ভাবে জেগে উঠেছিলো। পায়ের তল থেকে শেষ মাটিটুকু সরে গেল যখন, স্মৃতির টুটি টিপে দিল কেউ।

চর তখন টলটলে শিশু। উপুড় আকশ যেন ছায়া। ভাঙনের গন্ধ নেই কোনখানে—